কেমন ছিলেন তিনি ﷺ

(শামায়েলে তিরমিজীর সারসংক্ষেপ)

মুহাম্মাদ আল আমিন

কেমন ছিলেন তিনি ﷺ

(শামায়েলে তিরমিজীর সারসংক্ষেপ)

মুহাম্মাদ আল আমিন

সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

কেমন ছিলেন তিনি ﷺ

লেখকের কথা

প্রথমেই আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা, অবশেষে তিনি বইটি পাঠকের সামনে উপস্থাপনের তৌফিক দিয়েছেন।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এখন এমন পর্যায়ে, পরম আপনজন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। যিনি এসেছেন রহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে, যিনি এসেছেন আমাদের সার্বিক জীবনের চরিত্র-আদর্শ শিক্ষা দিতে, সে মহামানবকে আমরা নিজেদের জীবনে কতোটুকু অনুভব করি? যিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক, নেতা, ভাই, বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমরা কি আমাদের ভাই বা বন্ধু হিসেবে চিন্তা করি নাকি 'আল্লাহর রাসূল' চিন্তা করে দূর থেকেই তাঁকে শুধু সম্মান দিয়ে যাই? কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনচরিত, তাঁর সাহাবীদের জীবনচরিত পড়লে আমরা দেখি, সাহাবীগণ এমনকি অনেক অমুসলিমও রাসূল ﷺ-এর সাথে মিশেছেন একদম আপন মানুষের মতো। যেকোনো দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর সাথে। তিনিও একাত্ম হয়ে মিশেছেন তাঁদের সাথে। 'আল্লাহর রাসূল' বলে কোনোরূপ আলাদা ভাব-গাম্ভীর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকেননি।

আমার মনে হয় রাসূল ﷺ-এর জীবন প্রকৃতভাবে না জানা ও তাঁকে না চেনার কারণেই আমরা তাঁকে কেবল দূর থেকে সম্মান করে যাচ্ছি, কাছ থেকে অনুভব করতে পারছি না। আমার নিজেরও তেমনই চিন্তা ছিলো ইমাম আবু ঈসা তিরমিজী (রহঃ) এর বিখ্যাত গ্রন্থ "শামাইল্যুন নাব্যিয়ী" পড়ার আগে। গত বছর রোযায় ফোনের এপে কিছুদূর পড়েছিলাম। এই বছর লকডাউনে বাসায় বই খুঁজতে গিয়ে দেখি হার্ড কপি রয়েছে। শুরু করলাম পড়া। যতদূর এগিয়েছি ততই অনুভব করেছি, আমি রাসূল ﷺ-এর আশপাশেই আছি। তাঁর হাঁটাচলা, পানাহার, আলাপচারিতা, ইবাদাতের এত মনোমুগ্ধকর বর্ণনা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ১৪০০ বছর আগের সেই

মদীনায়। একেকটা অনুচ্ছেদ পড়ে নতুনভাবে খুঁজে পাচ্ছিলাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে। একরকম ঘোর নিয়ে পড়লাম বইটা। পড়ে যখন কিছুটা তৃপ্ত হলাম আমার নিজের কাছে মনে হলো আমার মতো আরো অনেক মানুষই তো রাসূল ﷺ-কে দূর থেকে শুধু সম্মানই করে যায়, কিন্তু একান্ত আপনজনের মতো তাঁকে অনুভব করে না।

ব্যস্ত এই জীবনে সবার হয়তো ২০০-এর চেয়ে বেশি পৃষ্ঠার, ৩০০ এর অধিক হাদীস পড়া হবে না। তাই যতটা সংক্ষেপে রাসূল ﷺ-কে মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যেই এই প্রচেষ্টা। শামায়েল এর প্রতিটা অনুচ্ছেদের সব হাদীস পড়ে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি দ্বীনী বিষয়ে খুবই অজ্ঞ মানুষ। পড়াশোনা শূণ্যের কোঠায়। শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা থেকে এই প্রচেষ্টা। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রকাশিত "শামাইলুন নাবিয়্যী" ও hadithbd.com-এর "সহীহ শামায়েলে তিরিমিযী"-এর অনুবাদ থেকেই মূলত কাজ করেছি। কাজ শুরু করার সময়ে হাতে গোণা যে কয়েকজন লোক জানতেন তাদের অনুপ্রেরণা শক্তি আমাকে যুগিয়েছে।

প্রথমত আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের প্রতি যারা আমাকে পড়াশোনার অবারিত সুযোগ দিয়েছে , বিশেষত আমার বড় ভাই যে প্রথম ক্লাসের বাইরের বই আমার হাতে তুলে দেয়, এরপর আমার ভাই ও উস্তাদ নাহী, যার হাত ধরেই ইলমের বিশাল রাজ্যের সন্ধান পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা শামিম ভাইয়ের প্রতি যিনি প্রথম হাদীসের সারসংক্ষেপ লেখার চিন্তা মাথায় প্রবেশ করান। আমার কাছের লোকদের মধ্যে মারিয়া প্রায়শই লেখার বিভিন্ন অংশের ব্যাপারে মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন, প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন নাসিফ, সালমান, হাসান ভাই। আমার বন্ধু আরিফ ও নজীবকেও ধন্যবাদ আমার কাজে উৎসাহ দেওয়া ও মানুষের কাছে আমার লেখা পৌছাতে সাহায্য করার জন্য। বইয়ের কভার ও প্রচারণামূলক ছবির ডিজাইন করেছে শামিল। অনেক বেশি ধন্যবাদ বন্ধু তৌকিরকে, যে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা সাহেবের সঙ্গে। মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা সাহেব তাঁর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও নিজ হাতে আমার মত সামান্য এক ব্যক্তির লেখা লাল-কলমে কাঁটাছেড়া করে বাক্য, শব্দ, বানান এমনকি দাঁড়ি-কমা পর্যন্ত ঠিক করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের কতশত

আলেম উনাকে দিয়ে তাঁদের বই সম্পাদনা করানোর আশায় বসে থাকেন, আর সেখানে আল্লাহ আমাকে সেই সুযোগ দিলেন! আলহামদুলিল্লাহ! উনার সম্পাদনা ছাড়া আমার এই লেখা হয়তো পাঠযোগ্য হয়ে উঠতো না। আল্লাহ তাঁর সারাজীবনের দ্বীনের জন্য খেদমত কবুল করুন ও নেক হায়াত দান করুন।

আল্লাহ আমার এই কাজকে যদি কবুল করেন এবং একজন মানুষেরও যদি এই লেখা থেকে উপকৃত হয় তবেই আমার সার্থকতা। পরিশেষে দুরুদ ও সালাম সেই মহামানবের প্রতি যিনি না এলে দুনিয়াটা এতো সুন্দর হতো না, আমরাও থেকে যেতাম অজ্ঞতায়।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

অনুচ্ছেদঃ ১

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুলিয়া বা দৈহিক গঠন

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় তিনি বেশি লম্বা ছিলেন না আবার বেশি খাটোও ছিলেন না, ছিলেন মধ্যম গড়নের। তাঁর দেহবর্ণ ছিলো গৌর বা উজ্জ্বল তাতে কিছুটা তামাটে বা বাদামী ভাব ছিলো। তাঁর বাবরি চুল ছিলো যা দুই কানের লতি বা দুই কাঁধের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিলো। চুল খুব বেশি সোজা আবার খুব বেশি কোঁকড়ানোও ছিলো না বরং ঈষৎ কোঁকড়ানো বা ঢেউ খেলানো ছিলো। তাঁর মুখমন্ডল ছিলো ঈষৎ গোলাকার বা প্রশস্ত। ভ্রু যুগল ছিলো কিঞ্চিৎ বক্র ও ঘন সন্নিবিশিষ্ট। দাঁত ছিলো চিকন ও উজ্জ্বল, সামনের দুই দাঁতের মাঝে কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিলো। মুখে ঘন দাঁড়ি ছিলো। তাঁর পেট ও বুক সমতল কিন্তু প্রশস্ত ছিলো। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটি সরু রেখা ছিলো। মাথা ও হাড়ের গ্রন্থিগুলো ছিলো স্থূল ও মজবুত। দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিলো প্রশস্ত। তাঁর হাত-পা বেশ মাংসল ও শক্তিশালী ছিলো। পায়ের পাতা ছিলো সমতল।

রাসূল ﷺ- এর সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর সাহাবীগণ বলেছেন, তিনি ছিলেন চাঁদের তুলনায় অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে নূরের চমক খেলে যেত। তাঁর মতো কাউকে তাঁর আগে বা তাঁর পরে কখনো দেখা যায়নি।

অনুচ্ছেদঃ ২

মুহরে নবূওয়াত

রাসূল ﷺ এর অন্যতম একটি নিদর্শন ছিলো মুহরে নবূওয়াত। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীস এসেছে। সেসবের বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এ মুহরে নবূওয়াতের অবস্থান ছিলো তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে। সাহাবীরা এই মোহরে নবূয়াতের আকৃতি বা কেমন দেখতে তা বুঝাতে বিভিন্ন

উপমা বা উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। কেউ বলেছেন কবুতরের ডিমের মত লাল মাংসপিণ্ড, আবার কেউ বলেছেন এক গুচ্ছ লোমের সমষ্টি, কারো বর্ণনায় পাওয়া যায় এক টুকরা সুঢৌল মাংসপিণ্ড। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় মুহরে নবূয়াত হাতের মুঠোর মতো আকৃতির ছিলো যার চারপাশে ছিল ছোট ছোট তিলের সমাহার ছিলো।

অনুচ্ছেদঃ ৩

রাসূল ﷺ-এর চুলের বর্ণনা

রাসূল ﷺ এর চুল দুই কানের অর্ধেক বা কানের লতি পর্যন্ত বা প্রায় কাঁধ বরাবর প্রলম্বিত ছিলো। সেগুলো চারটি গুচ্ছে বিভক্ত ছিলো। তাঁর চুল খুব বেশি সোজা আবার খুব বেশি কোঁকড়ানো ছিলো না বরং ঈষৎ কোঁকড়ানো বা ঢেউ খেলানো ছিলো। তিনি প্রথম দিকে চুলে সিঁথি কাটতেন না, কারণ তা মুশরিকরা করতো ও আহলে কিতাবরা চুল স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিত। পরবর্তীতে অবশ্য আল্লাহর আদেশ পেলে তিনি চুলে সিঁথি কাটতেন।

অনুচ্ছেদঃ ৪

রাসূল ﷺ-এর কেশবিন্যাস সম্পর্কে

রাসূল ﷺ চুল আঁচড়াতেন ও মাথায় তেল ব্যবহার করতেন, অধিক তেল ব্যবহারের কারণে তাঁর মাথার কাপড় বা টুপিতে তেল লেগে যেতো। তিনি চুল-দাঁড়ি আচড়ানোর সময় সর্বদা ডানদিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন। তবে তিনি বারবার চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, বরং মাঝে মাঝে আঁচড়াতে বলেছেন ।

অনুচ্ছেদঃ ৫

রাসূল ﷺ-এর সাদা চুল সম্পর্কে

এই সম্পর্কিত হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল ﷺ-এর বেশি চুল পাকেনি, শেষ বয়সে তাঁর মাথার সিথিতে মাত্র কয়েকটি বা অল্প কয়েকগাছি চুল সাদা হয়েছিল। তবে তেল লাগালে সেই সাদা চুল দেখা যেত না।

অনুচ্ছেদঃ ৬

রাসূল ﷺ-এর খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে

রাসূল ﷺ চুলে খেযাব বা মেহেদী ব্যবহার করেছেন এমন বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়।

** উপরের অনুচ্ছেদ ও এই অনুচ্ছেদ থেকে বুঝা যায় তিনি খুব কমই খেযাব ব্যবহার করেছেন যদিও তিনি সকলকে খেযাব ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদঃ ৭

রাসূল ﷺ-এর সুরমা ব্যবহার

রাসূল ﷺ "**ইসমিদ**" সুরমা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি প্রতিরাতে ঘুমাতে যাবার আগে ৩ বার করে প্রতি চোখে সুরমা লাগাতেন। "**ইসমিদ**" সুরমাকে তিনি সর্বোত্তম বলেছেন এবং এর উপকারিতা হিসাবে তিনি বলেন, এটি চোখের জ্যোতি বর্ধন ও চোখের পাতার লোম গজাতে সহায়তা করে।

অনুচ্ছেদঃ ৮

রাসূল ﷺ-এর পোশাক

রাসূল ﷺ-এর প্রিয় পোশাক ছিলো জামা। এছাড়াও তিনি ইয়ামানী চাদর পরতে পছন্দ করতেন। তাঁর জামার হাতা ছিলো কব্জি পর্যন্ত। এছাড়া তিনি রুমী জুব্বাও পরেছেন। রাসূল ﷺ লাল, সবুজ, জাফরানী, কালো ইত্যাদি রং-এর কাপড় পরেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি উম্মতকে সাদা রং-এর কাপড় ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন। তিনি জামা-কাপড়, পাগড়ি সবকিছু পরিধান করার আগেই দুয়া করতেন ও ডানদিক থেকে পরা শুরু করতেন এবং খোলার সময় বামদিক থেকে খুলতেন।

অনুচ্ছেদঃ ৯

রাসূল ﷺ-এর জীবনযাত্রা সম্পর্কে

রাসূল ﷺ-এর জীবনে কোনো ভোগ বিলাসের সুযোগ ছিলো না। তিনি লোকজনের সাথে বসে আহার করলে বা মেহমান আসলে পেটভরে খেতেন এছাড়া তিনি কখনো পেট ভরে রুটি বা গোশত খাননি। তাঁর পরিবার ও পরিবার সংশ্লিষ্ট লোকজন প্রায়শই ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ১০

রাসূল ﷺ-এর মোজা

রাসূল ﷺ মোজা ব্যবহার করেছেন এবং উযূ করে সেগুলো পরার পর পুনুরায় উযূর সময় সেগুলোর উপর মাসেহ করেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ১১

রাসূল ﷺ -এর জুতার বর্ণনা

রাসূল ﷺ পশমবিহীন চামড়ার জুতা (বা স্যান্ডেল) ব্যবহার করেছেন। তাতে দুইটি করে ফিতা ছিলো। তিনি সেগুলো পরে ওযু করেছেন ও নামায পড়েছেন**। রাসূল ﷺ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটতে করতে নিষেধ করেছেন। তিনি দুই পায়েই জুতা পরতে বলেছেন অন্যথায় খালি পায়ে হাঁটতে বলেছেন। তিনি জুতা পরার সময় আগে ডান পায়ে পরিধান করতে বলেছেন ও খোলার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খুলতে বলেছেন।

** জুতায় নাপাক না থাকলে তা পরে নামায পড়া জায়েয।

অনুচ্ছেদঃ ১২

রাসূল ﷺ-এর আংটির বর্ণনা

রাসূল ﷺ রুপার আংটি ব্যবহার করেছেন। তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিলো। তিনি এই আংটি সিলমোহরের কাজে ব্যবহার করতেন। এর নিচের লাইনে "মুহাম্মাদ', মধ্যম লাইনে "রাসূল" এবং উপরের লাইনে "আল্লাহ" (অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) লেখা ছিলো। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর এই আংটি আবু বকর (রাঃ), এরপর উমর (রাঃ) এর হাতে ছিলো। এরপর উসমান (রাঃ) এর হাতে ছিলো, অবশেষে এটি "বিরে আরীস" নামক কূপে পড়ে হারিয়ে যায়।

অনুচ্ছেদঃ ১৩

রাসূল ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে রাসূল ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন। তবে হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ) তাঁদের বাম হাতে আংটি পরতেন। রাসূল ﷺ একবার সোনার আংটি বানালে তা দেখে অনেক লোক সোনার আংটি বানিয়ে পরা শুরু করলো। পরে রাসূল ﷺ সেটি খুলে ফেলে দেন আর কখনো পরবেন না বললে লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে দেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৪

রাসূল ﷺ-এর তরবারির বর্ণনা

রাসূল ﷺ-এর তরবারির হাতল বা বাঁট ছিলো রৌপ্য খচিত।

অনুচ্ছেদঃ ১৫

রাসূল ﷺ-এর লৌহবর্মের বর্ণনা

যুদ্ধে রাসূল ﷺ লৌহ বর্ম পরিধান করেছেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি দুটি লৌহ বর্ম পরিধান করেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৬

রাসূল ﷺ-এর শিরস্ত্রাণের বর্ণনা

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ মাথায় শিরস্ত্রাণ পরা ছিলেন। এছাড়াও যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ শিরস্ত্রান ব্যবহার করেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৭

রাসূল ﷺ-এর পাগড়ির বর্ণনা

রাসূল ﷺ মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করেছেন। তিনি পাগড়ি বেধে এর দুই প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধের মাঝ বরাবর ছেড়ে দিতেন। তাঁর কালো রঙের পাগড়ি ছিলো।
**অন্য কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় রাসূল ﷺ-এর সবুজ পাগড়িও ছিলো।

অনুচ্ছেদঃ ১৮

রাসূল ﷺ-এর লুংগির বর্ণনা

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল ﷺ-লুংগি (দুই প্রান্ত সেলাই বিহীন) পরেছেন। অনেক সাহাবী তাঁকে লাল রঙের লুংগি পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পরনে মোটা কাপড়ের লুংগি ছিলো।
তিনি লুংগি বা পাজামা পায়ের গোছা পর্যন্ত ঝুলাতে অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন এগুলো যাতে পায়ের গোছা স্পর্শ না করে।

অনুচ্ছেদঃ ১৯

রাসূল ﷺ-এর পদব্রজে হাঁটাচলা সম্পর্কে

রাসূল ﷺ যখন হাঁটতেন তখন সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটতেন যেন উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে অবতরণ করছেন। তিনি দৃঢ় পদে দ্রুত হাঁটতেন, হেঁটে তাঁর নাগাল পেতে সাহাবীদের খানিকটা কষ্ট হতো।

অনুচ্ছেদঃ ২০

রাসূল ﷺ-এর মাথায় কাপড়ের টুকরা ব্যবহার সম্পর্কে

রাসূল ﷺ অধিকাংশ সময় মাথায় এক খণ্ড কাপড় ব্যবহার করতেন। মাথার তেল সেই কাপড়ে লেগে সেই কাপড়কে তৈলাক্ত মনে হতো।

অনুচ্ছেদঃ ২১

রাসূল ﷺ-এর উপবেশন

বিভিন্ন হাদীস থেকে এর বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি কখনো কখনো দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু পেঁচিয়ে ধরে নিতম্বের উপর ভর করে বসতেন। আবার তাঁকে এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকতেও দেখা গিয়েছে। আবার কখনো তিনি চারজানু হয়েও বসেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ২২

রাসূল ﷺ-এর হেলান দিয়ে বসা সম্পর্কে

রাসূল ﷺ বালিশে হেলান বা ঠেস দিয়ে বসেছেন। তবে তিনি কখনো কোনো কিছুর উপর হেলান দিয়ে বসে আহার করতেন না।

অনুচ্ছেদঃ ২৩

রাসূল ﷺ-এর বালিশ থেকে অন্য কিছুতে হেলান দেওয়া সম্পর্কে

জীবন সায়াহ্নে রাসূল ﷺ যখন অসুস্থ ছিলেন তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে মসজিদে আসেন।

অনুচ্ছেদঃ ২৪

রাসূল ﷺ-এর আহারের নিয়ম-কানুন

রাসূল ﷺ তাঁর তিন আংগুলের সাহায্যে আহার করতেন ও আহার শেষে সেই তিনটি আংগুল ভালোভাবে চেটে নিতেন। তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় খাবার খেতেন না।

অনুচ্ছেদঃ ২৫

রাসূল ﷺ-এর রুটি সম্পর্কে

রাসূল ﷺ ও তাঁর পরিবার সর্বদাই পরিমিত আহার করেছেন। তিনি কখনো যবের রুটি দ্বারা পরপর দুই দিন তৃপ্তিসহ আহার করেননি, এমনকি পরপর দুইবেলা রুটি-গোশত দ্বারাও পেট ভরে আহার করেননি। তাঁর পরিবারে রুটি কখনো অতিরিক্ত হতো না, এমনকি খাবার না থাকায় কখনো কখনো তাঁর পরিবার পরপর কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটাতেন। তিনি কখনো ময়দার রুটি বা পাতলা রুটিও খাননি, যবের মোটা রুটিই ছিলো তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রধান খাদ্য। তিনি নিম্ন মানের খেজুরও পর্যাপ্ত আহার করতে পারেননি। তিনি উঁচু দস্তরখানে কখনো আহার করেননি বা রকমারি তরকারি অথবা চাটনির আলাদা আলাদা বাটি নিয়েও আয়েশ করে খাওয়া-দাওয়া করেননি। সচারাচর চামড়ার দস্তরখানে বসেই খাবার খেতেন।

অনুচ্ছেদঃ ২৬

রাসূল ﷺ-এর তরকারি (সালন) সম্পর্কে

রাসূল ﷺ সিরকাকে উত্তম ঝোল বলেছেন এবং আরো বলেছেন, যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর সালনবিহীন নয়। এছাড়াও তিনি মুরগি, হুবারার (এক ধরনের পাখি) গোশত খেয়েছেন। তিনি যাইতূনের তৈল আহার করতে ও গায়ে লাগাতে বলেছেন, কারণ তা মুবারক গাছ থেকে উৎপন্ন। যব, যাইতূনের তেল, গরম মশলা ও মরিচের গুড়ো দিয়ে তৈরি এক ধরনের খাবারও তিনি পছন্দ করতেন। রাসূল ﷺ-এর অন্যতম প্রিয় খাবার ছিলো লাউ। তাঁকে কোথাও আহারের দাওয়াতে তরকারীর সাথে লাউ পরিবেশন করা হলে তিনি লাউয়ের টুকরা খুঁজে খুঁজে খেয়েছেন এবং সাহাবীরাও তাঁর এ পছন্দের কথা জেনে তরকারি থেকে তাঁর জন্য লাউয়ের টুকরা খুঁজে খুঁজে রাখতেন। এছাড়াও রাসূল ﷺ ছাগলের পাঁজরের ভুনা গোশত, বাহুর গোশত, পৃষ্ঠদেশের গোশত খুব পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর এক বিবাহের ওয়ালীমা খেজুর ও ছাতু দিয়ে করেছিলেন। বীট ও

বার্লিও খেয়েছেন তিনি। তিনি সারীদকে (গোশতের ঝোলে রুটি ভিজিয়ে তৈরি করা খাবার) অন্য খাবারের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তিনি হাইস (খেজুর দিয়ে তৈরি এক ধরনের মিষ্টান্ন) খেয়েছেন। পাতিল ও পেয়ালার অবশিষ্ট খাদ্য খেতে তিনি পছন্দ করতেন। আর খেজুর তো তাঁর খাদ্যের তালিকাতে উপরেই ছিলো।

**অনেকে গোশত খাওয়ার পর উযূ করতে হবে বলে মত দিয়ে থাকেনো, তবে এই অধ্যায়ের হাদীসগুলো থেকে দেখা যায় তিনি গোশত খেয়েও পূর্বের উযূ দিয়ে নামায পড়েছেন। ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়া যাবে না এমন একটা মতও শোনা যায় কিন্তু এই অধ্যায়ের এক হাদীস থেকে দেখা যায় রাসূল ﷺ নিজেই ছুরি দিয়ে কেটে গোশত খেয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ফল, মধু, কালোজিরা ইত্যাদি খেতে তিনি পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদঃ ২৭

খাওয়ার আগে বা পরে রাসূল ﷺ-এর উযূর বর্ণনা

রাসূল ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর তাঁর সামনে খাবার পেশ করে সাহাবীরা উযূর পানি আনবে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে নামাযে দাঁড়ালেই কেবল তাঁকে উযূ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বা তিনি বলেন, “এখন কি আমি নামায পড়বো যে আমাকে উযূ করতে হবে?” তবে খাওয়ার আগে ও পরে উযূ করলে খাবারে বরকত হয় বলে তিনি বলেছেন।
**তিনি উম্মতের জন্য বিষয়টা সহজ করে দিয়েছেন। খাওয়ার আগে পরে তিনি নিয়মিত উযূ করলে তা অনেকটা ওয়াজিবের কাছাকাছি আমলে পরিণত হতো যা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হতো।

অনুচ্ছেদঃ ২৮

খাওয়ার আগে ও পরে রাসূল ﷺ যে সব দোয়া পড়তেন

রাসূল ﷺ সর্বদা **"বিসমিল্লাহ"** পড়ে খাওয়া শুরু করতেন, কারণ এতে খাবারে বরকত হয়। তিনি বলেছেন কেউ এটা বলতে ভুলে গেলে যেন বলে, **"বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু"** (খাওয়ার শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে)। তিনি ডান হাতে ও সামনের দিক থেকে খাওয়া আরম্ভ করতে বলেছেন। এছাড়াও আহার শেষে তিনি **"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমনা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলনা মিনাল মুসলিমীন"** (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন) অথবা **"আলহাম্‌দু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবাম মুবারাকান্ ফীহি গায়রা মুওয়াদ্দা'ইন ওয়ালা মুসতাগনান 'আনহু রব্বানা"** (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা অফুরন্ত, পবিত্র ও কল্যাণময়; এমন প্রশংসা যা বর্জন করা যায় না কিংবা তা হতে মুখাপেক্ষীহীন থাকা যায় না। হে আমাদের রব। (আমাদের দু'আ কবুল করে নাও), এই দুয়া করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে বান্দা এক গ্রাস খাবার খেয়ে অথবা এক ঢোক পানি পান করে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর গোযারী করে তার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন।

অনুচ্ছেদঃ ২৯

রাসূল ﷺ-এর পানপাত্র

রাসূল ﷺ-এর লোহার পাতযুক্ত একটি কাঠের মোটা পানপাত্র বা বারকশ ছিলো। পেয়ালাতে তিনি পানি, নাবীয (খেজুর দিয়ে তৈরি এক প্রকার পানীয়), মধু, দুধ সহ যাবতীয় পানীয় পান করেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ৩০

রাসূল ﷺ যেসব ফলমূল খেয়েছেন

রাসূল ﷺ খেজুরের সাথে একত্রে শসা, তরমুজ, খরবুজা ইত্যাদি খেতে পছন্দ করতেন। লোকেরা তাদের গাছে নতুন ফল পাকতে দেখলে তা নবী ﷺ-এর খেদমতে পেশ করতেন, সেই ফল হাতে নিয়ে তিনি মদীনার ফলমূল ও যাবতীয় বিষয়ের বরকতের জন্য দুয়া করতেন এবং নিকটস্থ কোনো ছোট শিশুকে ডেকে সেই ফল দান করতেন।

অনুচ্ছেদঃ ৩১

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পানীয় বস্তু সম্পর্কে

শীতল মিষ্টি পানীয় রাসূল ﷺ-এর খুব প্রিয় ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ যদি কাউকে কোনো কিছু আহার করান তাহলে তার বলা উচিত- **"আল্লা-হুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত'ইমনা খয়রাম্ মিনহু"**-(হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম ও উপকারী খাবার দান করো), আর যদি আল্লাহ কাউকে দুধ পান করান, তাহলে সে যেন বলে-**"আল্লা-হুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়াযিদনা- মিনহু"**- (হে আল্লাহ! তুমি এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়েও বেশি দানা করো)। রাসূল ﷺ বলেন দুধ ছাড়া আর কোনো জিনিসই নেই যা একই সাথে খাবার ও পানীয় উভয়ের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

** এছাড়াও মধু, মধুর শরবত, নাবীয (খেজুরের তৈরি শরবত) ইত্যাদি তিনি পান করতেন।

অনুচ্ছেদঃ ৩২

রাসূল ﷺ-এর পান করার নিয়ম সম্পর্কে

রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে ও বসে উভয় অবস্থায় পান করেছেন। তবে যমযমের পানি তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছেন। পানি পান করার সময় তিনি তিনবার (কোনো কোনো মতে দুই বার) নিশ্বাঃস নিতেন। তিনি এভাবে পান করাকে আরামদায়ক ও তৃপ্তিকর বলেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ৩৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে

রাসূল ﷺ-এর আতরদানি ছিলো এবং তা থেকে তিনি আতর ব্যবহার করতেন। কেউ সুগন্ধি উপহার দিলে তিনি ফেরত দিতেন না এবং তিনি বলেছেন, বালিশ, তৈল (সুগন্ধি), দুধ, ফুল ইত্যাদি উপহার হিসেবে পেলে ফেরত দেওয়া উচিত নয়। পুরুষদের তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে বলেছেন যার সুবাস প্রকাশ পায় কিন্তু রঙ দেখা যায় না আর নারীদের ক্ষেত্রে বলেছেন রঙ প্রকাশ পায় কিন্তু সুবাস তীব্র নয় এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে।

অনুচ্ছেদঃ ৩৪

রাসূল ﷺ-এর বাক্যালাপের ধরন

রাসূল ﷺ-এর অবিরাম ও দ্রুত কথা বলতেন না বরং ধীরেসুস্থে স্পষ্ট করে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে বলতেন যাতে তা উপস্থিত ব্যক্তি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, প্রয়োজনে কোনো কথা তিনি তিনবার করেও পুনরাবৃত্তি করতেন। তবে তিনি বহুক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে ও উম্মতের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন ফলে দীর্ঘ নিরবতা ছিলো তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং বিনা প্রয়োজনে তিনি কথা বলতেন না। কথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতেন এবং সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য বলতেন। তাঁর একটি কথা অপর কথা থেকে পৃথক ও সুস্পষ্ট হতো এবং তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম হতো না। তিনি কঠোর ভাষায় বা কাউকে হেয় করে কথা বলতেন না। আল্লাহর নিয়ামতের মর্যাদা দিতেন ও কোনো দোষ-ত্রুটি খুঁজতেন না। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে নিন্দা বা অযাচিত প্রশংসা করতেন না। পার্থিব বা সাংসারিক বিষয়ে রাগান্বিত হতেন না আবার দ্বীনী কোনো বিষয়ে সীমা লংঘন হলে তাঁর অসন্তোষ কিছুতেই থামতো না। তিনি ব্যক্তিগত কারণে কখনো ক্রোধান্বিত বা অসন্তুষ্ট হতেন না এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। কোনো বিষয়ের প্রতি ইশারা করলে সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলে হাত উল্টাতেন। যখন কথাবার্তা বলতেন তখন ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেটে চাপ দিতেন। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং অমনোযোগী হতেন। যখন তিনি আনন্দ-উৎফুল্ল হতেন (লজ্জাবশত) তখন তাঁর চোখ প্রায় বন্ধ করে ফেলতেন। অধিকাংশ সময় তিনি মুচকি হাসতেন। তখন তাঁর দাঁতগুলো বরফের ন্যায় উজ্জ্বল সাদারূপে শোভা পেতো।

অনুচ্ছেদঃ ৩৫

রাসূল ﷺ-এর হাসি

রাসূল ﷺ-এর মুখে প্রায়শই মুচকি হাসি লেগে থাকতো। তাঁর কোনো সাহাবী তাঁর সাথে দেখা করতে এলে তিনি মুচকি হাসি দিয়ে অভিবাদন জানাতেন। কখনো কখনো হাসলে তাঁর দন্তরাজিও প্রকাশ পেতো। তবে তিনি উচ্চশব্দে হা হা করে হেসেছেন এমনটি কখনো ঘটেনি।

অনুচ্ছেদঃ ৩৬

রাসূল ﷺ-এর রসিকতা

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে রসিকতা বা কৌতুক করেছেন হাদীসে তার প্রমাণ আছে। তাঁর রসিকতাও ছিলো অর্থপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ, সত্যের প্রকাশ এবং আনন্দদায়ী। তবে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলে রসিকতা করেননি, সর্বদা সত্যি কথাই বলতেন। যেমনঃ তিনি কোনো সাহাবীকে দুই কান বিশিষ্ট লোক বলে ডাকতেন, এক ছোট বাচ্চার পাখি মারা যাওয়াতে সে খুবই বিষণ্ণ ছিলো নবী ﷺ তার সাথে রসিকতা করে তাকে বলেন, “হে আবু উমায়ের! কি হলো তোমার নুগায়েরের।” এছাড়াও এক বৃদ্ধ মহিলার প্রশ্নের জবাবে কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না বলে তার সাথে রসিকতা করেন পরে তাকে জানান যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কুমারী ও যুবতী হিসেবে।

**এরকম আরো বেশ কিছু রসিকতার উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনে যা সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ৩৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাবার্তায় ব্যবহৃত কবিতামালা

রাসূল ﷺ কখনো কখনো আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কবি তুরাফা, কবি লাবীদ এদের কবিতা আবৃত্তি করতেন বা এসব কবিতা ব্যবহার করে উপমা দিতেন। যুদ্ধ, অবরোধ প্রভৃতি সময়েও (উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করতে বা অবস্থা বর্ণনা করতে) তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করছে দেখা গিয়েছে। সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করলে রাসূল ﷺ কখনো কখনো সেখানে উপস্থিত থেকে সেসব কবিতা শুনতেন ও মুচকি হাসতেন। আরবের অনেক কবি যাদের কবিতার বিষয়বস্তু তাৎপর্যপূর্ণ ও ইসলামের কাছাকাছি ছিলো রাসূল ﷺ তাদের প্রশংসাও করেছেন। এমনকি মসজিদে নববীতে রাসূল ﷺ-এর মিম্বার ছাড়াও ইসলামের কবি বলে খ্যাত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ)-এর জন্য একটি মিম্বার ছিলো যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি কাফের-মুশরিকদের রচিত কবিতার জবাবে রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা করতেন।

অনুচ্ছেদঃ ৩৮

রাসূল ﷺ-এর নৈশ আলাপ-আলোচনা

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে রাতের বেলায় প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি তাদেরকে অনেক সময় কাহিনী শোনাতেন আবার কখনো কখনো তাঁর স্ত্রীরা রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের জানা কোনো কাহিনী বা পছন্দের কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। রাসূল ﷺ সেসব কাহিনী শুনতেন এবং তা নিয়ে নিজের মতামতও দিতেন।

অনুচ্ছেদঃ ৩৯

রাসূল ﷺ-এর ঘুমের অভ্যাস

তিনি সাধারণত ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে (ডান কাত হয়ে) ঘুমাতেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন দুয়া করেছেন। তিনি সাধারণত দুয়া করতেন, **"রাব্বি কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক"**- (হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রক্ষা করুন সে দিনের শাস্তি থেকে যেদিন আপনার বান্দাদের পুনরুত্থিত করা হবে), **"আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া"**- (হে আল্লাহ! তোমার নামেই মৃত্যুবরণ (নিদ্রা) করছি এবং তোমার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হব), **"আলহামদু লিল্লা-হিল্লায়ী আত'আমানা ওয়াসাকা-না ওয়াকাফানা ওয়া আ ওয়ানা ফাকাম মিম্মান লা কা ফিয়া লাহু ওয়ালা মু'বী"**- (সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের আহার করান ও পান করান। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিদ্রা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের কোনো যথেষ্ট দানকারী নেই এবং কোনো আশ্রয়দাতাও নেই)। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি পড়তেন, **"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমা তানা ওয়া ইলায়হিন নুশূর"**- (সকল প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদের মৃত্যুর (ঘুমের) পর আবার জীবন দিয়েছেন (জাগ্রত করেছেন) আর তাঁরই দিকেই প্রত্যাবর্তন)। এছাড়াও তিনি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে পুরো শরীরে হাত বুলাতেন। তিনি তিনবার করে এরূপ করতেন। সুবেহ সাদেকের কাছাকাছি সময়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তিনি তাঁর কনুইয়ের উপর ভর রেখে হাত খাড়া করে হাতের তালুতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতেন।

** এই অনুচ্ছেদের একটি হাদীসে রাসূল ﷺ-এর ঘুমিয়ে নাক ডাকা ও সেই অবস্থা থেকে উঠে আবার উযূ না করে নামায পড়ার বিষয়টা তাঁর জন্য খাস ছিলো কারণ অন্য হাদীস থেকে যানা যায় তিনি বলেছেন "আমার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত থাকে"। আমাদের মত সাধারণ মানুষদের জন্য ঘুম উযূ ভঙ্গের কারণ।

অনুচ্ছেদঃ ৪০

রাসূল ﷺ-এর ইবাদাত-বন্দেগি

আল্লাহর রাসূল ﷺ এত দীর্ঘ সময় ধরে রাতে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর দুই পা ফুলে যেতো। কেউ যদি তাঁকে এ কষ্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতো এবং তাঁর পূর্বাপরের যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতো তিনি তখন বলতেন, "আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" তিনি রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এরপর উঠে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতেন, সর্বশেষে বিতর নামায পড়ে কিছু সময়ের জন্য শয্যা গ্রহণ করতেন। তিনি কখনো কখনো রাতের নামায ১২ রাকাত পড়েছেন (বিতর ছাড়া) আর বিতর সহ ১৩ রাকাত পড়েছেন। আবার কখনো কখনো তিনি মোট ১১ রাকাত নামায পড়েছেন যার মধ্যে ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ ও ৩ রাকাত বিতর আবার কখনো ১০ রাকাত তাহাজ্জুদ ১ রাকাত বিতর পড়তেন। অন্য বর্ণনায় কখনো কখনো ৯ রাকাত নামায পড়ার কথাও পাওয়া যায় আবার কোন রাতে তাহাজ্জুদ নামায না পড়ার কথাও পাওয়া যায়। তিনি রাতের নামায শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই রাকাত নামায পড়ে নিতেন। তাঁর রাতের নামাযে কিয়াম, রুকু, সিজদা, বৈঠক সব প্রচুর দীর্ঘ করতেন। তিনি কিয়ামের সমান সময় রুকু, রুকুর সমান সময় রুকু থেকে দাঁড়ানো অবস্থায়, সমান সময় সিজদা ও একই পরিমাণ সময় সিজদার মাঝের বৈঠকে পার করতেন। তিনি রাতের নামাযে একাদিক্রমে কুরআন শরীফের দীর্ঘতম সূরাগুলো পড়তেন আবার কখনো এমনও হয়েছে একটি মাত্র আয়াত পাঠ করে (সূরা মায়িদাঃ আয়াত ১১৮) তিনি রাত পার করে দিয়েছেন। এত দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে কিয়াম করতে যেয়ে কোনো কোনো সময় সাহাবীগণ হাঁপিয়ে যেতেন। তিনি দাঁড়িয়েই নামায পড়তেন তবে কখনো কখনো বসেও (বিশেষত শেষ বয়সে) নফল নামায পড়েছেন। তিনি রাতের নামাযে এত ধীর স্থিরতার সাথে সূরা পড়তেন যে ছোট সূরাও দীর্ঘতর সূরা থেকে দীর্ঘ মনে হতো। রাতে কখনো ঘুমের কারণে নামায পড়তে অপারগ হলে দিনের বেলা বারো রাকাত নামায পড়ে নিতেন। রাসূল ﷺ ফজরের পূর্বে দুই রাকাত, যোহরের পূর্বে ও পরে দুই-দুই করে চার রাকাত (তবে যোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত নামায পড়ার ব্যাপারেও হাদীস আছে), মাগরিবের পর দুই রাকাত ও এশার পর দুই রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করেছেন।

তিনি সুন্নাত নামাযসমূহ সাধারণত ঘরে পড়তেন। এছাড়াও তিনি ইশরাকের নামায ও দোহা বা চাশতের নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদঃ ৪১

রাসূল ﷺ-এর চাশতের নামায

রাসূল ﷺ-এর চাশতের নামাযের রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। চার রাকাত বা ছয় রাকাত বা আট রাকাত সবই হাদীসে এসেছে। কোনো বর্ণনা মতে তিনি নিয়মিত পড়তেন আবার কোনো বর্ণনা মতে সফর থেকে ফিরে এলে পড়তেন। তবে তিনি কখনো কখনো একটানা পড়েছেন আবার কখনো কখনো কিছুদিন ছেড়ে দিয়ে পড়েছেন। তবে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর যোহরের আগে চার রাকাত নামায নিয়মিত পড়তেন, কারণ হিসেবে তিনি জানান, এ সময় আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় ও যোহরের নামায না পড়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হয় না। তিনি চাইতেন এ সময় তার কিছু সৎকাজ আসমানে পৌঁছুক। বেশিরভাগ বর্ণনাইয় এই ৪ রাকাত নামাযের কথাই পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদঃ ৪২

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে নফল নামায পড়া সম্পর্কে

নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম নাকি মসজিদে এই প্রশ্নের জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, "তুমি তো দেখছো আমার ঘরে মসজিদের কত নিকটে। তথাপি ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায আমি ঘরে পড়তেই ভালোবাসি"।

অনুচ্ছেদঃ ৪৩

রাসূল ﷺ-এর রোযা

রাসূল ﷺ কোনো কোনো মাসে একটানা নফল রোযা রেখে যেতেন যে লোকজন ভাবতো তিনি বুঝি সম্পূর্ণ মাসই রোযা থাকবেন আবার কোনো মাসে একটানা রোযাহীন থাকতেন যে মানুষ ভাবতো এ মাসে হয়তো তিনি রোযাই রাখবেন না। তবে হিজরত করে মদীনায় আসার পর রমযান মাস ছাড়া কোনো মাসেই তিনি টানা এক মাস রোযা রাখেননি। কিন্তু শাবান মাসের প্রতি তিনি আলাদা গুরুত্ব দিতেন, এ মাসের প্রায় পুরোটাই (অল্প কয়েকদিন বাদ দিয়ে) তিনি রোযা থাকতেন। রাসূল ﷺ-এর নফল রোযার মধ্যে মাসের শুরুতে তিন দিন, জুমুআর দিন (শুক্রবার), মাসের যে কোনো সময় তিন দিন, কোনো সপ্তাহের শনি-সোম-বুধ পরের সপ্তাহের রবি-মঙ্গল-বৃহস্পতিবার, আশুরার দিন, রোযা রাখতেন। তবে সোম এবং বৃহস্পতিবারের রোযার ব্যাপারটা তিনি খুব খেয়াল রাখতেন, কারণ এই দুই দিন আল্লাহর নিকট বান্দার আমলসমূহ পেশ করা হয়। তবে তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত আমল করতে নিরুৎসাহিত করেছেন, কারণ শ্রাণতি-ক্লান্তির দরুণ একসময় আমলের প্রতি বিরক্তি চলে আসতে পারে। কম পরিমাণে হলেও নিয়মিত আমল রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রিয় ছিলো।

অনুচ্ছেদঃ ৪৪

রাসূল ﷺ-এর কিরাআত (কুরআন তিলাওয়াত)

রাসূল ﷺ-এর কিরাআত ছিলো অত্যন্ত পরিষ্কার ও প্রতিটি হরফ তিনি সুস্পষ্টভাবে, পৃথক পৃথক করে, আওয়াজ দীর্ঘ করে বা টেনে (যেমন- আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, এরপর থেমে একই ভাবে পরের আয়াত) পড়তেন। তিনি কখনো কিরাআত নীরবে আবার কখনো সশব্দে পড়তেন। তিনি ঘরে কিরাআত করলে অনেক সময় প্রাঙ্গণের লোক শুনতে পেত আবার কাবা ঘরে তিলাওয়াত করা

অবস্থায় আশেপাশে যাদের বাড়ি তারা রাসূল ﷺ-এর কিরাআত শুনেছে। তবে তিনি গায়কদের মত স্বর কাঁপিয়ে তিলাওয়াত করতেন না।

অনুচ্ছেদঃ ৪৫

রাসূল ﷺ-এর কান্নাকাটি প্রসঙ্গে

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর কান্নার শব্দ এক সাহাবীর কাছে চুলার উপর বাষ্পের চাপে ডেকচির শব্দের অনুরূপ মনে হয়েছে। কখনো কখনো কোনো সাহাবী রাসূল ﷺ-কে তিলাওয়াত করে শুনাতেন, এতে কখনো কখনো তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তো। একবার সূর্যগ্রহণ শুরু হলে রাসূল ﷺ নামাযে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর নামায এত দীর্ঘ ছিলো যে সাহাবীগণ অবাক হয়ে যান। দ্বিতীয় রাকাতের শেষ সিজদায় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আল্লাহর দরবারে উম্মাতের উপর যাতে বিপদ না আসে সেজন্য কাঁদতে থাকেনো। পরিবারের লোক বা সাহাবীদের মৃত্যুতেও রাসূল ﷺ-কে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখা গিয়েছে, তবে তিনি চীৎকার করে কাঁদতে বা বিলাপ করতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ৪৬

রাসূল ﷺ-এর বিছানা

রাসূল ﷺ-এর বিছানা ছিলো চামড়ার তৈরি আর তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিলো। অন্য স্ত্রী-র ঘরে তার বিছানা হিসেবে ছিলো চট, তা তিনি দুই ভাঁজ করে ঘুমাতেন। কোমল বা আরামদায়ক বিছানা তাঁর ছিলো না।

অনুচ্ছেদঃ ৪৭

রাসূল ﷺ-এর বিনয়-নম্রতা

রাসূল ﷺ কখনো তাঁর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন যেমনটা ঈসা আঃ-এর প্রশংসা করতে করতে সীমালংঘন করেছে নাসারাগণ (খৃস্টানরা)। তিনি তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলতে বলেছেন। যে কেউ চাইলে রাসূল ﷺ-এর এর কাছে আসতে পারতো, যে কোনো স্থানে তাঁর সাথে বসে কথা বলতে পারতো, তিনি কাউকে বঞ্চিত করতেন না। তিনি অসুস্থ লোকদের দেখতে যেতেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন, গাধার পিঠে চড়তেন, কোনো দাস-দাসী দাওয়াত দিলে কবুল করতেন। এমনকি কেউ সামান্য যবের রুটি ও পুরাতন চর্বি খাওয়ার দাওয়াত দিলেও তিনি তা নির্দ্ধিধায় গ্রহণ করতেন। কেউ উপহার দিলে তা গ্রহণ করতেন। ছোট বাচ্চাদের কোলে বসিয়ে আদর করতেন। তিনি ঘরে সাধারণ মানুষদের মতোই কাপড় পরিষ্কার, বকরীর দুধ দোহন ও অন্যান্য ঘরের কাজ করতেন। বিদায় হজ্জের সময় তাঁর বাহনের হাওদা ছিলো খুব পুরোনো এবং তাতে খুবই সস্তা একটা চাদর বিছানো ছিলো। তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর এ হজ্জকে প্রদর্শনেচ্ছামুক্ত ও খ্যাতিমুক্ত করার দুয়া করেছিলেন, যাতে তা সবার কাছে আদর্শ হয়ে থাকে। সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে চুড়ান্ত মাত্রার সম্মান করলেও তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না কারণ তিনি এটা অপছন্দ করতেন, যদিও তিনি কখনো কখনো নেতার আগমণে দাঁড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর গৃহের অবস্থানের সময়কে তিনটি ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ আল্লাহর ইবাদাতের জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনের জন্য এবং এক ভাগ নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্মের জন্য। এ কাজকর্মের সময়কেও তিনি ২ ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগে নেহায়তই নিজের জন্য এবং এক ভাগ সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য। এ সময়ে বিশেষ বিশেষ সাহাবীগণ তাঁর নিকট আসতেন। তাদের কাছে কোনো কিছু অব্যক্ত থাকত না। এ সকল লোকের মধ্যে জ্ঞানী ও গুণী সাহাবীগণ প্রথমে আসার অনুমতি পেতেন। তাদের ধর্মীয় মর্যাদার বিচারে তাদেরকে সময় দিতেন। কেউ এক, কেউ দুই, আবার কেউ ততোধিক প্রয়োজন নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট

থাকতেন এবং তাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ দিতেন, যা তাদের নিজেদের এবং পুরো উম্মতের উপকারে আসে।

এ সময় তিনি সমবেতদের লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ, তারা আমার বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দেবে। যারা কোনো কারণে আমার কাছে আসতে পারেনি, তোমরা তাদের জিজ্ঞাসা আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেবে। কারণ, যে ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তির নিবেদন শাসকের কাছে পৌছায় যে শাসক পর্যন্ত পৌছতে পারে না, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর কদমকে অটল রাখবেন। তোমরা এ ব্যাপারে সতর্ক হও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে কেবল প্রয়োজনীয় আলোচনাই হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের আলাপ-আলোচনা শুনতেন। সেখানে কোনো প্রকার বাহুল্য কথাবার্তা হতো না। সাহাবীগণ ধমীয় জ্ঞান আহরণের আগ্রহ নিয়ে আসতেন, দ্বীনের স্বাদ গ্রহণ করতেন এবং তারা কল্যাণের দিশারী হয়ে ফিরে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অহেতুক কথাবার্তা হতে নিজ জবানকে সংযত রাখতেন। মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। তাদেরকে কোনোভাবেই নিরুৎসাহিত করতেন না। সকল গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান করতেন এবং তাদের মধ্য থেকে তাদের নেতা মনোনীত করতেন। লোকদের আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাতেন। নিজ সঙ্গীদের খোজ-খবর রাখতেন এবং লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করে (কোনো প্রকার জটিলতা থাকলে) তা সংশোধন করে দিতেন। ভালোকে সমর্থন করে তাকে শক্তিশালী করতেন এবং খারাপকে খারাপ বলে প্রতিহত করতেন। কোনো প্রকার মতবিরোধ সৃষ্টি না করে সবকিছুতেই মধ্যমপস্থা অনুসরণ করতেন। লোকদের সংশোধন করতে কোনো প্রকার অলসতা করতেন না। নসীহত ও উপদেশ দানের সময় লোকেরা যেন উদাসীন ও বিরক্ত হয়ে না পড়ে, তিনি সে দিকেও খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেক কাজের জন্য তাঁর কাছে বিশেষ ব্যবস্থা থাকত। সত্যের ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা ছিল না, সীমা লংঘিত হতো না। যেসব লোক তাঁর কাছে আসত, তারা উৎকৃষ্ট লোকে পরিণত হতো। যেই ব্যক্তি অপরের কল্যাণ কামনা করত, সে-ই তাঁর নিকট উত্তম ব্যক্তিরূপে সম্মানিত হতো। আর সে ব্যক্তিই তাঁর কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে মনে হতো, যে অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতায় তৎপর ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠা-বসায় সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। যখন কোথাও যেতেন, যেখানেই তাঁকে বসতে দেওয়া হতো, তিনি সেখানেই বসতেন। অন্যদেরকেও অনুরূপ করার নির্দেশ

দিতেন। তিনি লোকের মাথা ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে নিষেধ করেন। এ কথা সত্য যে, তিনি যে আসনেই বসতেন, তাই মধ্যমনির আসনে পরিণত হতো। তিনি উপস্থিত সকলেরই কথা শুনতেন। উপস্থিত সকলেই মনে করতো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অধিক মর্যাদা দিচ্ছেন। তাঁর কাছে কেউ আসলে সে নিজে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি উঠে যেতেন না। কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তা না দিয়ে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। না থাকলে নম্রভাবে বুঝিয়ে বলতেন। তাঁর দান সবার জন্যই অবারিত ছিল। মায়া-মমতায় তিনি সকলের পিতা স্বরূপ ছিলেন। ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিকট সবাই সমান ছিল। তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞান, লজ্জা, ধৈর্য ও আমানতের। সেখানে কোনো প্রকার হট্টগোল হতো না এবং কারো মান-সম্মানেরও ক্ষতি হতো না। সকলেই সমান মর্যাদা পেতেন। তবে তাকওয়ার বিচারে একে অন্যের উপর মর্যাদাসম্পন্ন হতেন। একে অন্যের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করতেন। বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ করতেন। প্রয়োজনধারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো এবং ভিনদেশীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো।

অনুচ্ছেদঃ ৪৮

রাসূল ﷺ-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর নবী ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ পার্থিব বিষয় আলোচনা করলে তাতেও যোগ দিতেন আবার আখিরাতের বিষয়ে আলোচনা করলে তাতেও যোগ দিতেন এমনকি পানাহার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাতেও তিনি থাকতেন। তিনি সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তির সাথে কথা বলতে হলেও সম্পূর্ণ দেহ তার দিকে ফিরিয়ে কথা বলতেন, তার সাথে কোমল ব্যবহার করতেন। সবাই ভাবতো সেই তার গোত্রের শ্রেষ্ঠ লোক, সে কারণে তাঁকে তিনি এরকম সম্মান দিচ্ছেন। তিনি তাঁর খাদেমদের কোনো কাজে কখনো "উহ" (বিরক্তি প্রকাশস্বরুপ) শব্দটি পর্যন্ত বলেননি। তারা কেউ কোনো কাজ করলে সে সেটা কেনো করলো বা না করলে কেনো করেনি এরকম জবাবদিহিতা করেননি। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। কারো কোনো কিছু অপছন্দ হলে তিনি তা তাকে সরাসরি বলতেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো প্রকার অশোভনীয় কথা বলতেন না। বাজারেও তিনি উচ্চঃস্বরে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিকার মন্দ দ্বারা করতেন না; বরং ক্ষমা করে দিতেন। অতঃপর কখনো তা আলোচনাও করতেন না। তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত কখনো কোনো কিছুকে নিজ হাতে আঘাত বা প্রহার করেননি। তাঁকে যদি দুটি কাজের মধ্যে যেকোনো একটির অনুমতি দেয়া হতো, তবে তিনি সহজ কাজটি বেছে নিতেন, যতক্ষণ তা কোন পাপকাজ না হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সদা হাস্যোজ্জোল ও বিনম্র স্বভবের অধিকারী। তিনি রূঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের ছিলেন না। তিনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, অপরের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না এবং কৃপণ ছিলেন না। তিনি অপছন্দনীয় কথা হতে বিরত থাকতেন। তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না, আবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি দূরে থাকতেন, ঝগড়া-বিবাদ করা, অহংকার করা এবং অযথা কথাবর্তা বলা। তিনটি কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখতেন। কারো নিন্দা করতেন না, কাউকে অপবাদ দিতেন না এবং কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করতেন না। যে কথায় সওয়াব হয় শুধু তাই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন, যেনো তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

তিনি কথা বলা শেষ করলে অন্যরা তাঁকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞেস করতো। তাঁর কথায় কেউ বাদানুবাদ করতেন না। কেউ কোনো কথা বলা শুরু করলে তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নীরব থাকতেন। কেউ কোনো কথায় হাসলে বা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও হাসতেন কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত ব্যক্তির দৃঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করতেন। কখনো কখনো সাহাবীগণ অপরিচিত লোক নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, কারো কোনো প্রয়োজন দেখলে তা সামাধা করতে তোমরা সাহায্য করবে। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি নীরব থাকতেন। কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা আরম্ভ করতেন না। অবশ্য কেউ অযথা কথা বলতে থাকলে তাকে নিষেধ করে দিতেন, অথবা মজলিস হতে উঠে যেতেন, যাতে বক্তার কথা বন্ধ হয়ে যায়।

তাঁর কাছে কেউ কিছু প্রার্থনা করলে তিনি কখনো “না” বলেননি। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর। রমজান মাসে জিবরীল (আঃ) তাঁকে যখন কুরআন পড়ে শুনাতেন তখন তিনি এত অধিক পরিমাণে দান করতেন যেন প্রচন্ড বায়ু প্রবাহ বা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হত। আগামীকালের জন্য তিনি কিছু

সঞ্চয় করে রাখতেন না। তিনি কখনো কখনো তাঁর সাধ্যের বাইরে যেয়েও দান করতেন, যেমনঃ কোনো অভাবী কিছু চাইলে তখন তাঁর কাছে তা না থাকলে তিনি দোকান থেকে তাঁর নামে সেই জিনিস নিয়ে নিতে বলতেন এবং তাঁর হাতে অর্থ আসলে তা তিনি পরিশোধ করে দেওয়ার কথা বলতেন। কেউ তাঁকে উপহার দিলে তার পরিবর্তে তিনি তাকেও কিছু দিতেন।

অনুচ্ছেদঃ ৪৯

রাসূল ﷺ-এর লজ্জাশীলতা

তিনি পর্দানশীন কুমারী নারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। কোনো জিনিস অপছন্দ হলে তিনি তা লজ্জাবশত বলতেন না, সাহাবীগণ তাঁর চেহারা দেখেই তা বুঝে নিতেন।

অনুচ্ছেদঃ ৫০

রাসূল ﷺ-এর রক্তমোক্ষণ বা শিঙ্গা লাগানো প্রসঙ্গ

রাসূল ﷺ রক্তমোক্ষণ করেছেন বা শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং যে এই কাজ করেছিল তিনি তাকে পারিশ্রমিক দেন সেই সাথে সেই লোকটির মনিবকে বলে তার করের পরিমাণ হ্রাস করিয়ে দেন। তিনি তাঁর ঘাড়ের দুই পাশে, দুই কাঁধের মাঝ বরাবর ফোলা অংশ এমনকি ইহরাম অবস্থায় পায়ের পাতার উপরিভাগে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। তিনি একে উত্তম চিকিৎসা বা উত্তম প্রতিশেধক বলেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ৫১

রাসূল ﷺ-এর নামসমূহ

রাসূল ﷺ-এর বেশ কিছু নাম আছে। তিনি বলেন, আমার নাম মুহাম্মদ, আহমাদ, মাহী (ধ্বংসকারী), অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা কুফরী ধ্বংস করবেন। আমার নাম হাশির (একত্রকারী); লোকদেরকে একত্র করার আগে আল্লাহ তা'আলা আমাকে উঠাবেন। আমার নাম আকিব (সর্বশেষ আগমনকারী নবী): অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোনো নবীর আগমন হবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি মুহাম্মদ, আমি আহমাদ, আমি নবীউর রহমত (রহমতের নবী) আমি নবীউত তাওবা (তাওবার নবী), আমি মুকাফফী (নবী হিসেবে যথেষ্ট), আমি হাশির (একত্রকারী), আমি মালাহিমের (জিহাদকারী) নবী ।

অনুচ্ছেদঃ ৫২

রাসূল ﷺ-এর জীবন-জীবিকা সম্পর্কে

রাসূল ﷺ-এর জীবনে মোটেই আরাম-আয়েশ বা বিলাসিতার বাহুল্য ছিলো না। তিনি ও তাঁর পরিবার নিম্ন মানের খেজুর খেয়েও পেট ভরতে পারেননি। তাঁর ঘরে মাসের পর মাস চুলা জ্বলতো না, শুধু খেজুর ও পানি দিয়ে আহার করতেন। তিনি যদি কখনো সামান্য ভালো খাবারও খেতেন সাথে সাথে আল্লাহর নিয়ামতের প্রশংসা করতেন এবং কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত নিয়ে জিজ্ঞাসিত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাঁর দুঃখ, দুর্দশা বা ক্ষুধার দিনে কেউ তাঁকে পানাহার করালে তিনি সামর্থ্যবাল হলে সেই ব্যক্তিকে উপহার দিতেন। এমনকি বিভিন্ন অভিযানে ক্ষুধার কারণে গাছের পাতাও খেতে হয়েছে। এমন অনেক বিপদসংকুল দিন কেটেছে যে টানা এক মাস হযরত বিলাল (রাঃ) এর কাছে তাঁদের দুইজনের জন্য আহারোপযোগী খুবই সামান্য বস্তু ছিলো। দুই বেলা টানা তিনি কখনো রুটি-গোশত খেতে পারেননি (মেহমান আসলে তখন ব্যতিক্রম হয়েছে)। তাঁর ওফাতের (মৃত্যু) পর

সাহাবীরা ভালো কোনো খাবার খেতে গেলেই কান্না করে দিতেন এই কথা মনে করে যে রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি যবের রুটি দ্বারাও পেট ভরে খেতে পারেননি।

অনুচ্ছেদঃ ৫৩

রাসূল ﷺ-এর বয়স

সর্বোচ্চ সংখ্যক মতে রাসূল ﷺ-এর ওফাতকালীন বয়স ছিলো তেষট্টি বছর। অল্প কিছু বর্ণনামতে ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো পয়ষট্টি বছর (তবে এর ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সালকে আলাদা ধরে এই বয়স হিসেব করা হয়)।

অনুচ্ছেদঃ ৫৪

রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল

রাসূল ﷺ সোমবার ইন্তিকাল করেন। এর আগে বেশ কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার তীব্রতায় তিনি কয়েকবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাঁর নির্দেশে সে সময় আবু বকর (রাঃ) নামায ইমামতি করেন। একবার রাসূল ﷺ কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে তাঁর দুই সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে যান ও আবু বকর (রাঃ) এর ইমামমতিতে নামায আদায় করেন। তাঁর মৃত্যু কষ্ট দেখে তাঁর পরিবারের লোকসহ সবাই শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। মৃত্যু পূর্ব এই সময়টা তিনি আয়েশা (রাঃ) কক্ষে ছিলেন। তিনি যেদিন মৃত্যুবরণ করবেন সেদিন অর্থাৎ সোমবার ফজরের নামাযে তিনি তাঁর ঘর থেকে উকি দিয়ে সাহাবীদের নামাযের দৃশ্য দেখেন। এরপর আয়েশা (রাঃ) এর বুকে মাথা

ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় মৃত্যবরণ করেন। এই খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়া মাত্র পুরো মদীনা শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। ওমর (রাঃ) খোলা তলোয়ার নিয়ে হুমকি দেন কেউ যদি বলে রাসূল ﷺ-এর ওফাত হয়েছে তাঁর উপর তিনি আঘাত হানবেন। এই অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) আসেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর পবিত্র দেহ মোবারকের পাশে গিয়ে বসেন, তাঁর কপালে চুমু দেন। তিনি বাইরে এসে রাসূল ﷺ-এর ওফাতের ব্যাপারে আবারো সবাইকে জানান যে, এটাই স্বাভাবিক (সূরা যুমারঃ আয়াত ৩০)। লোকেরা তখন চেতনা ফিরে পায়। তিনি আরো জানান নবীরা যেখানে মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের কবর সেখানেই হয় সেই অনুযায়ী আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে তাঁর দাফনের ব্যবস্থা হয়। রাসূল ﷺ-এর জানাযার নামায আলাদা করে কেউ ইমামতি করেন নি। তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে গোসল দেওয়ার পর দশজন করে লোক তাঁর ঘরে যায় ও জানাজা পড়ে। এই কাজ সম্পন্ন হতে হতে সোমবার ও মঙ্গলবার দিন গড়িয়ে যায়। মঙ্গলবার দিন শেষে বা বুধবার দিন দিবাগত রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের দিন মদীনা অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যায়, লোকদের মনে হতে থাকে তাঁদের ঈমাণের জোর যেনো কমে গিয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ৫৫

রাসূল ﷺ-এর মীরাস সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একটি বর্ম, একটি খচ্চর ও এক টুকরা জমি ছাড়া কিছুই রেখে যাননি, এমনকি কোনো অর্থও রেখে জাননি এবং সেই জমিও দান করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান ফাতেমা (রাঃ) তাঁর পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দাবি করেন খলিফা আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে। কিন্তু তিনি জানান রাসূল ﷺ বলেছেন যে, নবীদের কোনো ওয়ারিশ হয় না, তবে রাসূল ﷺ যাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন ও যাদের ব্যয়ভার চালিয়েছিলেন তা চালু থাকবে। নবীগণ যা সম্পদ অবশিষ্ট রেখে যান তা সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।

অনুচ্ছেদঃ ৫৬

স্বপ্নে রাসূল ﷺ-এর দর্শনলাভ

রাসূল ﷺ জানান, যে ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে দেখলো সে আসলেই রাসূল ﷺ-কে দেখেছে, কারণ শয়তান তাঁর স্বরুপ ধারণ করতে পারে না। তিনি আরো জানান, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

আল্লাহ সুবহান তা'য়ালা আমাদেরকে তাঁর রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমাদের সৎকাজগুলোকে কবুল করে নিন ও আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন।

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।